বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 APR 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এদেশ-বিদেশ

পর্যটক

সম্প্রতি বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়েছে, গত ৩৫ বছরে দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। নিরক্ষরদের মধ্যে বয়স্কদের সংখ্যা শতকরা ৭৪ ভাগ। আগামী দু'হাজার সাল নাগাদ এই সংখ্যা কিছুটা কমে এলেও বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৪ কোটি ৭৩ লাখে। এর সঙ্গে প্রাইমারী স্কুলে আদৌ ভর্তি না হওয়া ২৩ লাখ ও স্কুলত্যাগী ১ কোটি ২৭ লাখ যোগ হয়ে এ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ৬ কোটি ২৩ লাখে।

এই পরিসংখ্যান থেকে আমাদের শিক্ষা বা সাক্ষরতার হারের যে নৈরাশ্যজনক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাতে উদ্বিগ্ন ও বিচলিত না হয়ে পারা যায় না। অন্য এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত ৩৬ বছরে সাক্ষরতার হার শতকরা ৫ ভাগও বাড়েনি। ১৯৫১ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ১৮·৯ শতাংশ। ১৯৬১ সালে তা এসে দাঁড়ায় ২০·৮ শতাংশে। ১৯৭৪ সালে আরও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৪·২৭ ভাগ। কিন্তু ১৯৮১ সালে তা হ্রাস পেয়ে ২৩·৮ শতাংশে নেমে আসে। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত এই হারে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিগত ৩৫-৩৬ বছরে দেশে লোকসংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও আনুপাতিক দিক থেকে তা পর্যাপ্ত নয়। এতে শিক্ষিত বা সাক্ষর লোকের মোট সংখ্যা অবশ্যই আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সাক্ষরের শতকরা হার যতটা বৃদ্ধি উচিত ছিল ততটা বৃদ্ধি পায়নি। সাক্ষরতার হার সংক্রান্ত উল্লেখিত পরিসংখ্যানটি থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ৩৬ বছরে সাক্ষরতার হার শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি আসলে কোনো বৃদ্ধিই নয়। উন্নয়নকামী একটা দেশের জন্যে এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক আর কি হতে পারে! বোধকরি, সাক্ষরতার এই নাজুক হার-অবনতি লক্ষ্য করেই ১৯৮১ সালে সরকার সাক্ষরতা অভিযান চালু করেন। এ অভিযান ১৯৮২ সালের কিছু সময় পর্যন্ত চলে বাতিল হয়ে যায়। দেখা যায়, এই সল্পতম সময়ে ৭ লাখ বয়স্ক লোক সাক্ষর হয়ে গেছে। কেন এভাবে এই জনগুরুত্বসম্পন্ন কর্মসূচীটি বাতিল করা হলো, তা এখনও রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে।

একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের মত শিক্ষায় অনগ্রসর উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা বা সাক্ষরতার হার দ্রুত বৃদ্ধি করতে হলে প্রয়োজন সাক্ষরতা অভিযান বা গণশিক্ষা কর্মসূচী ব্যাপকভাবে চালু করা এবং প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণসহ একে অবৈতনিক ও সার্বজনীন করা। সাক্ষরতা কর্মসূচী কেন বাতিল করা হলো, আগেই বলেছি তা এখনও রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। এক বছরের কিছু বেশী সময়ে যে কর্মসূচীর আওতায় ৭ লাখ বয়স্ক লোককে সাক্ষর করা সম্ভব হলো, সেই কর্মসূচীটি বাতিল করা আদৌ যুক্তি ও বাস্তবসিদ্ধ কাজ হয়নি। দ্বিতীয়তঃ যতদূর জানা গেছে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের অন্যতম কর্মসূচী গণশিক্ষা কার্যক্রম খাতে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় যে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল আজ পর্যন্ত সে অর্থের একটা কানাকড়িও ব্যয় হয়নি। অথচ ইতোমধ্যে পাঁচসালা পরিকল্পনার মেয়াদকাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সাক্ষরতার হার স্থবির হয়ে যাবার এটা একটা মৌলিক কারণ।

প্রাথমিক শিক্ষার হাল-হকিকতও খুব হতাশাব্যঞ্জক। বিগত ৪০ বছরে যতগুলো শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠন করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির রিপোর্টেই একইভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির জন্যে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ অপরিহার্য। ঐসব রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা অবশ্যই অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হতে হবে। এ যাবতকালের সকল সরকারই অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন এবং বহুবার প্রতিশ্রুতিও ঘোষণা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, আজও প্রাথমিক শিক্ষা পুরোপুরি অবৈতনিক হতে পারেনি। আর বাধ্যতামূলক তো হয়ইনি।

প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণের অন্যতম পূর্বশর্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি। আর একে বাধ্যতামূলক করার পূর্বশর্ত অবৈতনিক করা। অর্থাৎ অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ অবাধ-অবারিত করতে হলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এসব বিদ্যালয়ের সমস্ত ক্ষয়-খরচা সরকারকে বহন করতে হবে। জানা যায়, ১৯৮১ সালে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মোট ৪৪ হাজার ২৭টি। এর পর ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত সময়ে এই সংখ্যার সঙ্গে মাত্র একটি বিদ্যালয় যোগ হয়। ওয়াকিবহাল ব্যক্তি মাত্রেরই জানা, দেশে বেসরকারী উদ্যোগে হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। এসব বিদ্যালয়ের একটি বড় অংশের বোর্ড রেজিস্ট্রেশনও আছে। রেজিস্ট্রিকৃত এই বিদ্যালয়গুলো দীর্ঘদিন ধরে সরকারীকরণের জন্যে সংশ্লিষ্ট দফতরে আবেদন জমা দিয়ে বসে আছে। কিন্তু নানা অজুহাতে এসব বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করা হচ্ছে না। রেজিস্ট্রিকৃত বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের একটা ন্যূনতম ভাতা দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল কিছুদিন আগে এবং সে অনুযায়ী কাজও শুরু হয়েছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ঐ উদ্যোগ থেমে গেছে।

বেসরকারী উদ্যোগে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা আমাদের দেশে কত বড় একটা দুঃসাধ্য কাজ তা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। এদেশের মানুষ অধিকাংশই দরিদ্রের চেয়ে দরিদ্র। তাদের পক্ষে বেতন দিয়ে কিংবা নিজেদের উদ্যোগে বিদ্যালয় পরিচালনা করে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। তবু এ অসম্ভব যারা সম্ভব করে, তারাও বেশী দিন তাদের উদ্যম ও আগ্রহ টিকিয়ে রাখতে পারে না। হয় ছেলে-মেয়েকে বিদ্যালয় ছাড়িয়ে দিতে হয়, না হয় বিদ্যালয়ই একসময় আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়।

আমাদের ধারণা, বেসরকারী অনুমোদিত ও অননুমোদিত প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলো সরকারীকরণ করা গেলে বিদ্যালয় সমস্যার একটা বড় রকমের সুরাহা হয়ে যেতে পারে। কারণ, এসব বিদ্যালয়ের নিজস্ব জায়গা যেমন আছে, তেমনি আছে লেখা-পড়া চালানোর মত ঘর ও আসবাবপত্র। এসব বিদ্যালয়ে এককালীন কিছু অর্থ বরাদ্দ করে ভালোভাবে কার্যোপযোগী করে তোলা সম্ভব। অতঃপর প্রাথমিক শিক্ষাকে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করার কর্মসূচী নেয়া হলে তা সহজেই কার্যকর হতে পারবে। একটি শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলা যদি আমাদের প্রত্যাশা হয়, তাহলে অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ এর পাশাপাশি সাক্ষর কর্মসূচী বা গণশিক্ষা কর্মসূচী পুনরায় চালু করার বিষয় ত্বরিৎভাবে বিবেচনা করতে হবে। দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্যে শিক্ষা, এই লক্ষ্য কখনই বাস্তবায়িত হতে পারবে না, যদি না এই সময়ের মধ্যে ২ কোটি ৮ লাখ ছেলে-মেয়ে ও ৬ কোটি ২৩ লাখ নিরক্ষর লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়। দুঃখজনক হলেও বলতে হচ্ছে, আমাদের শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ খুবই কম। এই সীমিত অর্থ দিয়ে এত বড় বিশাল কাজ সম্পাদন করা অসম্ভব। কাজেই, শিক্ষাখাতে ব্যয় যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি কার্যকর, গঠনমূলক ও বাস্তবধর্মী কর্মসূচী নিতে হবে এবং এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে গৃহীত প্রক্রিয়াকে সহজ ও মসৃন করতে হবে।